Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 231-239
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

সামাজিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু অধিকার

ফেরদৌস আরা কাবির *

সামাজিক উন্নয়ন

একটি উন্নয়নশীল দেশের সমস্ত পকিল্পনার সাফল্য নির্ভর করে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করে উৎপাদন ও শিল্পায়নের উপর। আবার উৎপাদন বাড়ানো এবং শিল্পায়ন তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য একটি বাস্তবমুখী কর্ম ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই বাস্তবমুখী থাকবে যাতে বিভিন্ন বিষয়ে কৌশলী ও পারর্দশী তৈরি হওয়ার একটা পরিকল্পনা থাকবে। তবেই সম্ভব হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে সে দেশের সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

আমাদের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ নারী। এ বিরাট জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। যদি এই জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আনা যায় তাহলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। দেশের উন্নতি নির্ভর করবে কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে অর্থের আয় সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে। সুতরাং আমাদের দেশে যদি বাস্তবমুখী এবং মহিলাদের উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহন করা যায় তবে কুশলী ও পারদর্শী কর্মীদের একটা বিরাট অংশ হবে এ দেশের নারীরা। তাই এ দেশে এমন ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ কার উচিৎ যে পকিল্পনায় সহজেই নারীরা অংশ নিতে ইচ্ছুক। তবেই গৃহকোনে বসবাসকারী নারীদের বেশির ভাগই কর্ম বিমুখ না থেকে আসবে কর্মের উদ্দেশ্যে আর তাতেই আসবে সত্যিকারের অর্থনৈতিক মুক্তি।

নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন অর্থনৈতিকসহ সামগ্রীক উন্নয়নের পূর্বশর্ত একথা কেউই আজ অস্বীকার করবে না। সরকারও যে তা স্বীকার করেন তার অন্যতম প্রমাণ হল বাংলাদেশে সংবিধানের "সংবিধানে প্রাধান্যসহ সমসুযোগ" সংক্রান্ত সকল বিষয়কে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা। ১৯৯৭ এ নারী নীতি প্রণয়ন, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীর অর্ন্তভুক্তির বিধান প্রচলন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন ঘোষণার (Millennium Development Declaration) রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের স্বাক্ষর করা এবং সকল পরিকল্পনা দলিলে নারীর উপস্থিতি।

* (লেখক: এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, প্রাক্তন ব্যাংকার ও সমাজসেবক)

নারীর ক্ষমতায়ন আসলে সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হতেই হবে। কারণ এ দেশের জন্মটাই হয়েছিল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সবার উন্নয়নের আকাঙ্খা নিয়ে। যে আকাঙ্খার মর্মবস্তু হলো বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকৃত উন্নয়ন হলো মানব উন্নয়ন (Human Development) আরো সঠিক অর্থে বলতে হয় মানবিক উন্নয়ন (Human Development) আর এর অর্ধেক জনগোষ্ঠিকে বাদ দিয়ে কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রকৃত এ উন্নয়নের অর্থ হতে হবে

(১) মানুষের পরির্পূর্ণ জীবনের সুযোগ সৃষ্টি ও তা সম্প্রসারণ (Ensuring opportunities for a full life)। এ দিকে নারীরা পিছিয়ে আছে।

(২) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বহি:স্থদের অর্ন্তভূক্তিকরণ (inclusion of the excluded)। অথচ নারীরা বহি:স্থই ছিল বহি:স্থই আছে।

(৩) মানুষের জন্য পূর্ণ স্বধীনতা ভোগের সুযোগ সম্প্রসারণ (Ensuring full freedom that people shall enjoy) যেখানে থাকবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা Economic empowerment রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সুবিধাদি, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এসব স্বাধীনতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী অস্বাধীন।

(৪) মানুষ তার নিজের জন্য যে জীবন মূল্যবান মনে করে সে জীবন বেছে নেবার সুযোগ সম্প্রসারণ Choices to lead livis people value এর ক্ষেত্রেও নারী অবশ্যম্ভাবীভাবেই পশ্চাদপদ।

(৫) অ-স্বাধীনতার সকল উৎস তিরোহিত করা Removal of all sources of unifreedom নারীর জন্য এ ধরনের প্রক্রিয়া চালু নেই।

(৬) সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকারকে শ্রদ্ধা করা Respecting constitutional and justifiable rights নারীর ক্ষেত্রে আদৌ বিষয়টি মান্য করা হয়না।

(৭) সকল ধরনের দারিদ্র উচ্ছেদ, নির্মূল, হ্রাস করা (eradicating proverty)

(৮) বঞ্চনার ফাঁদ ভেঙ্গে ফেলা (Breaking deprivation trap) দারিদ্র উদ্ভুত বঞ্চনা, ক্ষমতাহীনতা, উদ্ভুত বঞ্চনা, নি:সঙ্গতা বিচ্ছিন্নতা একাকিত্ব উদ্ভুত বঞ্চনা, শারীরিক দুর্দশা উদ্ভুত বঞ্চনা ভঙ্গুরতা উদ্ভুত বঞ্চনা এসবে কোন বঞ্চনা থেকে নারীমুক্ত এ মুক্তির প্রক্রিয়ার বা অস্তিত্ব কোথায়?

মানবিক উন্নয়নের উল্লেখিত মর্মবস্তু ও এ দেশে বাস্তব জীবনে স্বীকৃত নয়। নারীর জন্য তো আরো বেশী অস্বীকৃত। আর দরিদ্র নারীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অস্বীকৃত। উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশেষত: নারীকে কখনো অবস্থান করানো হয়নি। সম্ভবত: সচেতনভাবেই এটা করা হয়নি। পিতৃতান্তিকতাসহ সমস্ত ধ্যান ধারণা থেকে শুরু করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট অনেক কারণই এর পেছনে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

গ্রামে গঞ্জে কি শহরে বন্দরে সর্বত্রই নারীরা শিক্ষিত হচ্ছে এবং ব্যাপক হারে কর্মস্থলে কাজ করছে। পুরুষের পাশাপাশি যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। কোন কাজ একার পুরুষের নয় এ ধ্যান ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বর্তমান সময়ে দু'জন পুরুষের পাশাপাশি দু'জন নারীও দুর্গম হিমালয় জয় করে এসেছে। তাই বলা যায় জগতে যা কিছু কল্যাণকর অর্ধেক তার গড়িয়াছেন নারী অর্ধেক তার নর।

অনেক সময় নারী পুরুষের চেয়ে নারী সৎ ও দক্ষ কর্মী হিসাবেই বিবেচিত হচ্ছে। অর্জন করছে কর্মী হিসেবে সম্মান, ঘুচছে তার অর্থনৈতিক দৈন্য' তাই কর্মী নারীদের ক্ষেত্রে বিয়ের অনীহা বাড়ছে। এর কারণ হচ্ছে পারিবারিক অশান্তি। যৌতুকের জন্য নারী নির্যাতনের হীন ঘটনা। তবে মেয়েরা ব্যাপকভাবে কর্মক্ষেত্রে আসাতে পারিবারের অভাব ঘুচছে। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। যে ঘরে দুই তিনটা মেয়ে আগে বোঝা হিসেবে বিবেচিত হত এখন সেসব ঘরগুলিতেই মেয়েরা আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তাদের কারণেই মা বাবা সুখের মুখ দেখছেন। গার্মেন্টস শিল্পে ব্যাপকভাবে এসব নারীর অংশগ্রহণ করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। ফলে পোশাক শিল্পের এসব মেয়েরাই দেশের গোল্ডেন গার্ল হিসেবে বিদেশে পরিচিত হচ্ছে। এছাড়া আয়া বুয়া নার্স ডাক্তার এমন কোন পেশা নেই যেখানে নারীর অবাধ বিচরণ নেই। গ্রামের এসব মেয়েরাই এখন বিদেশে গিয়ে আয়া, বুয়া, নার্স এর কাজ করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

শিক্ষিত মেয়েরা দেশে বিদেশে সবখানেই নিজেদের যোগ্যতার সাক্ষর রাখছে। দেশের শিক্ষিত মেয়েরা দেশের উচ্চ পর্যায়ের সকল স্তরে নিজের যোগ্যতা নিয়ে কাজ করছে। এদের মধ্যেও মারাত্মকভাবে কাজ করছে বিয়ে ভীতি।

দোর্দন্ড প্রতাপ আর সফলতা নিয়ে কাজ করা এসব মেয়েদের যখন বিয়ে দেওয়া হয় তখন তারা যেন সহজেই পরিবেশের স্বীকার হয়ে যায়। অন্যের অন্যায় আর অবিবেচক কথা আর কাজের সাথে নিজেকে মিলাতে পারেনা বলে তাদের জীবনে নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। তাদের অনেকেই বরণ করে নেয় নির্মম মৃত্যু। আর যারা প্রতিবাদি হয়ে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তারা সংসার থেকে বেরিয়ে আসে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে স্বামী আর সন্তান থেকে অনেক দূরে। মনে হয় মৃত্যু এর চেয়ে ভাল। কিন্তু কাপুরুষের মত এমন মৃত্যু যে বরণ না করে সংসার ত্যাগ করে তাকে যেন প্রতিনিয়তই মরতে হয়। মানুষের তীক্ষ্ণ খোটা আর কটাক্ষ কথা আর রক্ত চক্ষুর চাহনী প্রতিনিয়তই তাকে আঘাত হানে। প্রশ্ন হলো নারী কখন কিভাবে সমাজে মর্যাদায় সমাসীন হবে? যদিও বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতায় নারী পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের এটা কখনো প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু মাতৃত্বের কারণে নারীর কর্ম পরিধি গৃহ ভিত্তিক এবং বর্হিজগতের জন্য পুরুষ নির্ভর।

মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত হচ্ছে। যোগ্যতা প্রমাণ করে সব ধরনের পেশায় অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু মেয়েটি যখন বিয়ের পর মা হচ্ছে তখন সন্তান কোথায় রাখবে? শহরে যৌথ পরিবারের সংখ্যা কমে বাড়ছে একক পরিবারের সংখ্যা। এ ভাবনায় কেউ কেউ চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। নারীর ক্ষমতায়নের কথা দিকে দিকে উচ্চারিত। তবে সামাজিক অবকাঠামো এখনো কর্মজীবি মায়ের অনুকূলে নয়। কেননা এদেশে নেই কোন ভাল শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র। অনেক ক্ষেত্রে গৃহপরিচারিকার কাছেও সন্তান রাখতে নিরাপদ বোধ করেন না মা বাবা। নারী উন্নয়ন বা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সমস্যা একটা হুমকি স্বরূপ এবং সমাধানের দ্রুত পথ খুঁজতে হবে।

এমনিতে পুরুষ-নারীর অবদানকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে কম গুরুত্বপুর্ণ আখ্যা দিয়ে তাকে অধস্তন করে রাখার প্রক্রিয়া থেকে জেন্ডার সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আর এটিকে কেন্দ্র করেই সমাজ নারী-পুরুষের বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। ক্রমান্বয়ে এ প্রক্রিয়া প্রথা, আচার, আচরন, বিধি ও আইন সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমাজ বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

সিডও সনদের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জৈবিক পার্থক্যের কারনে আরোপিত বাধা সমুহকে নির্মূল করা। বাংলাদেশের মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন সরকারের কাছে বার বার আবেদন জানায় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলুপ্ত সনদ বা সিডও সনদের বাস্তবায়ন করার জন্য। বাংলাদেশ সরকার সব কয়টি সনদ বাস্তবায়নের জন্য স্বাক্ষরতা দিলেও দুটি ধারা ২ ও ১৬-১ (গ) ধারার আপত্তি তুলে নেয়নি। সংবিধানের ১০,১১,১৯,২৭,২৮,২৯ নম্বর ধারায় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই সিডও সনদে ২ ধারা ও ১৬-(গ) ধারার প্রতি আপত্তি আসলে নারী পুরুষের সাংবিধানিক বিষয়টি অস্বীকার করার সামিল। অথচ পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশে এই আইনের আপত্তি তুলে নেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক দেশের মত এই দেশেও পাকিস্তান আমলে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন সংস্কার হয়েছে যা আজও কার্যকর। এছাড়া যৌতুক অধিকার পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ যৌতুক বিরোধী আইন ১৯৯০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১০০০ হয়েছে। অথচ সিডও দুটি ধারায় আপত্তি রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের। সিডও সনদ বাস্তবায়ন বহুলাংশে সে দেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সে কারনে আমরা দেখি বহু সনদ অনুমোদনের পর একে সংবিধানে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এ উদ্দেশ্যে কখনো কখনো দেশের আইন ও প্রশাসনিক কাঠামোতে সিডও সনদকে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে পুরাতন সংবিধানের পরিবর্তে নতুন সংবিধান প্রণোয়ন করে। এক্ষেত্রে কলম্বিয়া ও উগান্ডা ১৯৯১ ও ১৯৯৫ সালে সিডও সনদের ধারা সমুহ প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে নতুন সংবিধান রচনা করে। আবার ব্রাজিল ১৯৮৮ সালে সনদের আলোকে নারীর মানবাধিকারের ইস্যুসমুহ অর্ন্তভুক্ত করে সংবিধানে পরিবর্তন আনে। রাষ্ট্র কর্তৃক সংবিধানের সনদের মৌলিক ধারা সমুহের প্রতিফলন না হলেও স্বাধীন চিন্তার ব্যবস্থা ও জেন্ডার সংবেদনশীল আইনের মাধ্যমেও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনের পদক্ষেপ নেয়া যায়। এজন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচারকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষভাবে সুশীল সমাজ ও এনজিওদের সিডও সনদ বাস্তবায়নের সচেতনতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

আগে যেমন ছিল তেমনই অবস্থায় আছে নারী নির্যাতন। তবে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক কিভাবে আসবে এর প্রতিকার? যত আইনই করুক যত ভাবেই শিক্ষিত হউক, যত শ্রমই একজন নারী ঘরের বাইরে দিক না কেন, কিছুতেই যেন তার আসল ভাগ্য ফেরে না, তার আসল মর্যাদা সে পায়না। এমনটা হয় কেন? আমার মনে হয় আইনের পাশাপাশি ধর্মীয় মুল্যবোধ আর ধর্মের প্রতি পরিপুর্ণ জ্ঞান একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে পরিণত করতে পারে।

একজন নারীকে তার সম্পত্তি থেকে কোন ভাবেই বঞ্চিত করা যাবেনা। তার অজ্ঞতা তার ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব তাকে তার পাওনা আদায় থেকে বঞ্চিত করতে পারে কিন্তু তা অন্য কোন ভাবে নয়।

যৌতুক যা তার জন্য অসম্মানের, নিছক দেখাদেখি বা সমাজের নিকৃষ্ট এক ধারাবাহিকতার জন্য তার উপর দাবি করা হয় তা কোন ভাবেই মেনে নেয়া ঠিক নয়। তার উপর ধর্মীয় অনুশীলন মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখায়। অপরাধ পাপ কাজ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে। ইসলামিক আইন মতে নারীরা কোরানিক শেয়ারার। কাজেই তাকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না বা করা উচিৎ নয়। যদি কেউ এ কাজ করে তাবে তা হীনমন্যতা থেকে করে। কাজেই নারী যেখানে পরিবারের সম্পত্তির একজন আইনগত উত্তরাধিকারী সেখানে তাকে যৌতুক দিয়ে ছোট করার প্রবনতা কেন? তার কাছ থেকে জোর করে যৌতুক চাওয়া বা তাকে যৌতুকের জন্য চাপ দেয়া একটা ঘৃণিত কাজ।

একজন নারীকে প্রথমত: তার বাবা-মা বা পরিবারের প্রধানের কাজই হলো তাকে পরিপুর্ণভাবে মানুষ করা সঠিক মূল্য দিয়ে গড়ে তোলা। এরপর সে যখন স্বাবলম্বী হয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করে তখন সে তো সকলের স্নেহের আর আদরের ধনই হবার কথা বরং তা না করে উল্টা নানা সমস্যার তৈরি করা হয় তাকে ঘিরে। নানাভাবে তাকে অপদস্থ করা হয় তার পরিবারে এবং এভাবেই একজন নারীর জীবন চক্র গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে থাকে। এ থেকে কেউ বের হতে পারে বা পারেনা। নারীর এ নিষ্ঠুর জীবনচক্র, একজন নারীর জীবনে যে কোন মুহুর্তে যে কোন বিবাদ এনে দেয় সে যত মেধাবী, যত কর্মক্ষম, যত ধনাঢ্য পরিবারের হোকনা কেন? সবই তার নিয়তি এটাই ভাবা হয় তার ক্ষেত্রে। মানুষের গড়া নিয়তি মেনে সব সময় চুপ করে থাকা সচেতন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শিক্ষা, ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে গড়ে তুলতে পারলে একজন নারীর জীবন বদলে যাবে, বদলে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ নারীকে Educate, Empower, Enable করে তুলতে পারলে তাদের জীবন ধারা বদলে যাবে।

মেয়েদের যোগ্যতা এখন সবার কছেই প্রমাণিত। দুটি বিশ্ব যুদ্ধেও এর প্রমাণ হয়েছে সর্বাধিক। এ সময় সমাজে পুরুষের এক চেটিয়া পেশাগুলিতে মহিলাদেরকে ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়েছে। ১৯১৯ সালে যুদ্ধে সমগ্র বৃটেনে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় পোষ্টার দেখা গিয়েছিল। পোষ্টারে সামরিক পোষাকে একজন তরুনীকে দেখা যায় একটি বাচ্চাকে বোমা বিধ্বস্ত বাড়ীর নিচ থেকে বের করে নিয়ে যেতে। মেয়েটির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী বোমা বিধ্বস্ত বৃটেনের সাহস ও দৃঢ়তার প্রতীক। মেয়েটির দক্ষ ভঙ্গীর নিচে মাতৃত্বের অনুভুতির পরশটুকু হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দাগ কাটে। এটা যে সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারন সবাই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে অসংখ্য মেয়ে একই বিপদ সমান সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছে। কাজেই এখন আর প্রশ্ন উঠেনা যে মেয়েরা শুধু ঘরকন্যার কাজেই উপযোগী।

তবে এটা অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, চাহিদা মেয়েদের কাছে অর্ধেক পথ এগিয়ে দিয়েছে। আজকের অত্যন্ত জটিল ভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কাঠামোতে সব ধরনের স্বাভাবিক গুণের প্রয়োজন। তবুও নারী পুরুষ ভেদে কিছুটা তারতম্য লক্ষ করা যায়। আর এ জন্যই প্রয়োজন নারীর উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ যা নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করবে।

অর্থনীতির দুটি দিক, একটি তার আয়ের দিক অপরটি ব্যয়ের দিক। একটি দেশের সমস্ত মানব শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিক্ষা ও কর্ম কুশলতা অর্জনের পর নারী পুরুষকে নির্বিশেষে কাজে লাগাতে হবে। নারী পুরুষ ভেদে কাজের সুযোগ কর্মকুশলতা অনুযায়ী সমান ভাবে কাজ বন্টন করা দরকার। একটি পুরুষ কাজে ঢোকার পর হতে অবসর গ্রহন পর্যন্ত যতখানি কাজ করতে পারে একটি নারীর পক্ষে তা সম্ভব হয়না। কেননা সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন এবং সংসার ধর্ম পূর্ণাঙ্গভাবে পালনের জন্যই এই তারতম্য ঘটে।

দেশের সমস্ত মানুষের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শিল্পায়ন সম্ভব সেই বৃহত্তর পরিকল্পনা প্রথম পদক্ষেপ হবে একটি সুষ্ঠু সুন্দর পরিবার ও সমাজ কাঠামো সংস্কার মুক্ত নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরি করা।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। একটি সুদূর প্রসারি বিজ্ঞান ভিত্তিক মানসিকতা নিয়ে কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে। আমাদের সমাজের শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার। আর এদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দ্বায়িত্ব মা-বাবা তথা দেশের সবারই। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শিশু জন্মের পর হতে শিশু স্কুলে

না যাওয়া পর্যন্ত তার মায়ের সহচার্য থেকে তাকে বেশীক্ষণ বাইরে না রাখা অর্থাৎ তার মাকে বেশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত না রাখা অর্থাৎ এ সময় মাকে হালকা কাজে নিয়োজিত রাখা দরকার। অবশ্যই মায়ের সহচার্য ছাড়াও যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নত ধরনের কোন পথ শিশুর মানসিকতা বিকাশের জন্য উপযুক্ত মনে হয় তবে তারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিটি মাকে আবার পরিকল্পিত সংখ্যক সন্তান ধারণ সম্বন্ধে পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে হবে। তবেই মায়ের পক্ষে নির্দিষ্ট কর্ম পূর্ণ করে মর্যাদার সঙ্গে অবসরে যাওয়া সম্ভব। মায়ের মানসিক শান্তি আগামী দিনের বিশ্ব শান্তির একমাত্র প্রতিশ্রুতি।

যে কোন আদর্শ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহনের সময় একথা মনে রাখতে হবে যে, সক্ষম অর্থনীতি যেন সবল পরিচ্ছন্ন জীবন বোধের জন্ম দেয়। সেই জন্যই আদর্শ পরিবার ও দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে মানসিক প্রস্তুতির জন্য পুরুষের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। নারী পুরুষের সম্পর্ক যে স্বার্থকে কেন্দ্র করে তা হলো সন্তান। সন্তান ও রাষ্ট্র যে স্বার্থকে কেন্দ্র করে আন্দোলিত হয় তা হলো শিশু।

আর এ শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক ও অর্থনীতির উত্তরাধীকারী। তাই মনোবিজ্ঞান ও শিশু মনস্তত্ত্ব পুরুষদের পাঠ্যকর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত করা দরকার। সনাতন শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। আজকের মানুষের মুক্তির আন্দোলনের যে দাবি তার প্রথম কর্মসূচী দেশের ভবিষ্যত নাগরিকের জন্যই গ্রহণ করতে হবে। কেননা সেখানেই দ্রুত সুফল লাভের সম্ভাবনা বেশী।

এছাড়া অনেক উচ্চ শিক্ষিত মহিলা বাচ্চাদের নিরাপদে রাখার অভাবে বাইরে বা অফিসে, আদালতে যেতে চান না। সুতরাং এ দেশে সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য সরকারী ও সমবায় পদ্ধতিতে Child Care & Day Care চালু করলে এসব শিক্ষিত নারীরা তাদের শিশুদের রেখে দেশের ও সমাজের কাজে অংশ গ্রহন করতে পারে।

সুতরাং উপযুক্ত কাজের পরিবেশ পরিকল্পিত বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলেই নারীরা কর্মবিমুখতা থেকে কর্মের দিকে ঝুকে পড়বে। নারী তার উপযুক্ত কর্মের সম্মান পেলেই দেখাতে পারবে তার দক্ষতা আর সে পরিনত হবে ভাল কর্মীরুপে। ভালকর্মীই সফল উৎপাদনের চাবিকাঠি। উৎপাদন বাড়া মানে আয় বাড়া। আর আয় বাড়া মানে অর্থনৈতিক উন্নতি আসা। সুতরাং এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে নারীকে তার উপযুক্ত কাজ দিতে পারলে এবং কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে দিলে সেও অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

আমাদের দেশের বাস্তবতা ও আমদের পিতৃতান্ত্রিক সমস্ত ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় নারী ক্ষমতায়ন বিষয়টি একটি গবেষণা ফলাফল উল্লেখ্য করা প্রয়োজন। পশ্চিমা একজন সমাজ গবেষক গবেষণার কাজটি করেছিলেন বার্মায় বর্তমানে মায়ানমারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ঐ গবেষক বার্মায় গিয়ে দেখলেন যে নারীরা সব সময়ই পুরুষের পিছনে পেছনে হাঁটেন। এ থেকে তিনি এ উপসংহারে উপনীত হলেন যে বার্মায় নারীরা পশ্চাৎপদ, অক্ষমতায়িত এবং পিতৃতান্ত্রিকতার শিকার।

আমাদের মধ্যবিত্ত সুশিল সমাজে নারী চিন্তকদের সংখ্যা এখন অনেক । নারীর প্রকৃত অবস্থাটা প্রত্যেকে নিজের মত করে অথবা নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক দিয়ে বিবেচনা করে অথবা অন্য কারো এজেন্ডা অনুযায়ী বিচার বিশ্লেষন করেন। আর তদানুযায়ী নারী উন্নয়নে "ক্ষমাতয়নে" অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ প্রেসক্রিপসন দিয়ে থাকে। এ দেশে নারীরা প্রথমত: নারী বলে নিরন্তন বঞ্চনার শিকার আর দ্বিতীয়ত: নারী দরিদ্র মানুষ হিসেবে বঞ্চিত।

এদেশে ১৫ কোটি মানুষের ৯ কোটি ৮৯ লাখ মানুষ সরাসরি দরিদ্র বিত্তহীন মানুষ যাদের ৮২ ভাগ অর্থাৎ ৮ কোটি ৯০ লাখ গ্রামের মানুষ আর বাদ বাকী ১৮ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ৮০ লাখ শহরে বাস করে। শ্রেণী কাঠামোর আরেক প্রান্তে আছে ধনী মানুষ, যাদের সংখ্যা ৪১ লক্ষ। আর মাঝখানে আছে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ মধ্যবিত্ত মানুষ। এ মধ্যবিত্ত মানুষ আবার বিত্তের মানদন্ডে তিন ভাগে বিভক্ত। দুই কোটি ৫৪ লাখ মানুষ মোট মধ্যবিত্তের ৫৪% নিম্নমধ্যবিত্ত। ১ কোটি ৪৬ লাখ মোট মধ্যবিত্তের ৩১% মধ্যবিত্ত আর বাদবাকী ৭০ লাখ মোট মধ্যবিত্তের ১৫% উচ্চ মধ্যবিত্ত।

বিগত কয়েক বছরে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি আর প্রকৃত আয় হ্রাসের প্রবনতা তা থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে দরিদ্র বিত্তহীন মানুষ এখন আগের চেয়ে আরও দরিদ্র হয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র বিত্তহীন মানুষের কাতারে যোগ দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে ১৫ কোটি মানুষের এদেশে প্রকৃত দরিদ্র বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ১২ কোটি ৪৩ লাখ। আর এ ১২ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে কোন মাপকাঠিতেই দরিদ্র। আর এ মানুষের অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লক্ষ নারী। ৬ কোটি ২০ লক্ষ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২% এর ৮০%ই আছে গ্রামে আর ২০% আছে শহরে। এরা শহরের বস্তিতে ভাসমান মানুষ হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত। বয়োবৃদ্ধ শিশু কিশোরী যুবতী হিসেবে হাওর-বাওর চরে আদিবাসী মানুষ হিসেবে নিম্নবর্ণ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষসহ সকল প্রান্তিক মানুষ হিসেবে আছে।

৬ কোটি ২০ লক্ষ দরিদ্র বিত্তহীন প্রান্তিক নারীর মধ্যে কতজন জানেন যে-

১. সংবিধান নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করে ? অনুচ্ছেদ-২৮(২)।

২. সংবিধান নারী পুরুষের সমসুযোগ স্বীকৃত? অনুচ্ছেদ- ১৯ (১)

৩. সংবিধানে আছে জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক। অনুচ্ছেদ-৭(১)।

৪. সংবিধান মতে নারীর অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষার অধিকার আছে? অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)।

৫. কাজ পাবার অধিকার সংবিধানিক অধিকার। ১৫ (খ)।

৬. যুক্তি সঙ্গত বিশ্রাম বিনোদন ও অবকাশের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার অনুচ্ছেদ ১৫ (গ)।

৭. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্বব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা মাতৃ পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার। অনুচ্ছেদ-১৫ (ঘ)।

৮. জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তিদান করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ-১৪।

৯. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ-১৭ (গ)।

১০. সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। অনুচ্ছেদ-২৭।

১১. দেশে যে ২ কোটি বিঘা খাস জমি জলা আছে তাতে দরিদ্র নারীপুরুষের ন্যায্য হিস্যা রয়েছে।

এসব সাংবিধানিক ও ন্যায় অধিকার সম্পর্কে ৬ কোটি ২০ লাখ দরিদ্র বিত্তহীন প্রান্তিক নারী সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে সম্ভবত: সচেতনভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ণ বিষয়টি ছিটেফোটা কোন প্রকল্প গ্রহণের বিষয় নয়। বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির বিষয়। বিষয়টি হতে হবে যা দরিদ্র বিত্তহীন নারীকে প্রকৃত অর্থেই অধিকার সচেতন করবে। তবেই দরিদ্র নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণসহ সার্বিক ক্ষমতায়ণ নিশ্চিত করা সম্ভব। যদি তাদেরকে অধিকার সংশ্লিষ্ট সচেতনায়ন প্রক্রিয়ায় আওতাভুক্ত করা যায়।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে

- পুরুষের চেয়ে নারীকে প্রায় ১৫ গুণ বেশী সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করতে হয়।
- বাংলাদেশের নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হার প্রায় ৬৭%।
- দেশে মোট নারী শ্রমশক্তির শতকরা ৭৮ ভাগ এখন কৃষিখাতে নিয়োজিত।
- দেশের সার্ভিসখাতে শতকরা ১২ ভাগ ; শিল্পখাতে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ নারী শ্রমশক্তিতে অবধান রাখছে।
- বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার গ্রামীণ ফোনের মাধ্যমে গ্রামেঞ্চলে প্রায় দেড় কোটি মানুষকে টেলিফোন সেবা দিচ্ছে নারীরা।
- ৪৩.৩ শতাংশ নারী এবং ৪৩.৩ শতাংশ পুরুষ পুরোপুরি ভাবে গৃহস্থালী কাজে যুক্ত আছে।
- ৯.৪ ভাগ নারী এবং ৩৪.৫ শতাংশ পুরুষ পুরোপুরিভাবে অর্থ উপার্জন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।
- জাতীয় উৎপাদনে নারীর অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত হতে পারে যদি নারীর অমূল্যায়িক কাজের অংশ জাতীয় অর্থনীতিতে গণনা করা হয়। অন্যদিকে পুরুষের অবদান কমে আসবে ৭৫ শতাংশ থেকে ৬৯ শতাংশে।
- গ্রামীণ নারীরা ৫৩ শতাংশ ব্যয় করে অর্থনৈতিক কাজে যেখানে পুরুষেরা ব্যয় করে ৪৭ শতাংশ।
- আই এল ওর হিসাবে বাংলাদেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের ৪৩%।
- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪২ শতাংশ। এর মধ্যে পোষাক খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪৩ শতাংশ এবং তা এসেছে নারীর হাত ধরে।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এ দেখা গেছে ৫ কোটি ৪১ লাখ মানুষ কর্মরত রয়েছে এর মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা ১ কোটি ৬২ লাখ।
- শুধুমাত্র বসতবাড়ির সবজি/ফল উৎপাদন পশু সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ ৪৫ থেকে ৮৫ শতাংশ।
- ড. আবুল বারাকতের গবেষণা অনুযায়ী সরকারী হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান ২০ শতাংশ তবে নারীরা যে গৃহস্থালী কর্মকান্ড করেন তার আনুমানিক মূল্য আড়াই লাখ কোটি টাকা। সে হিসাবে জিডিপিতে নারীর অবদান দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশে। আর এসব তথ্য তুলে ধরার মূল উদ্দেশ্য হল (১) নারীর প্রতি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন। (২) নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করার মধ্য দিয়ে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি। আর এজন্য তিনটি কর্মসূচি গহন করতে হবে। তাহলো (১) দেশব্যাপী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, (২) নারীর অর্থনৈতিক গৃহস্থালী কাজের অবদান বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা

করা। (৩) নারীর অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান ও জিডিপিতে অর্ন্তভুক্তির জন্য এডভোকেসি করা।

- কেন এই প্রচারাভিযান করতে হবে, 'তার মূল কারণ হল পরিবার সমাজ, রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে নারীরা যুগযুগ ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। কিন্তু এই অবদানের নেই কোন স্বীকৃতি নেই কোন পরিমাপক। যার ফলে আড়ালেই পড়ে থাকে নারীর এ অবদানের কথা। নারীরা অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক দুক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। আর উপার্জনমূলক কাজের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য কাজে নারীর অবদান অপরিসীম যেমন গৃহস্থালী কাজ পারিবারিক কৃষিকাজ, খাদ্য উৎপাদন, সন্তান লালনপালন, শিশু-বৃদ্ধ ও অসুস্থদের সেবা শুশ্রুসাদান গার্হস্থ ব্যবস্থপনা, এমনকি পাড়া মহল্লা বা সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর মঙ্গলময় বিভিন্ন সামাজিক কাজেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে নারী।

নারীর এসব পারিবারিক বা গৃহস্থালী কাজ কর্ম অদৃশ্য ও মজুরী বিহীন এবং সে কারণেই স্বীকৃতিহীন। এসব কষ্টসাধ্য কাজের মূল্য কখনো পরিমাপ করা যায় না। বরং বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে এখনও ৮০শতাংশ নারী পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বারা সহিংসতা শোষণ বৈষম্য ও অমানবিকতার শিকার।

নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের পূবশর্ত। কিন্তু আমরা দেখছি নারীর অধ:স্তন অবস্থা নারীর প্রতি প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারী শিকার হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্যের। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র নারীর অর্থনৈতিক অবদানসহ সকল প্রকার অবদান নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠান নানা ধরণের গবেষণা করছেন। পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা-লেখিও হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু যে কাজটি আজ পর্যন্ত হয়নি তা হলো এ বিষয় ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টানো এবং নীতি নির্ধারকের পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করা যাতে সরকারি সব পর্যায়ে থেকে নারীর এই অবদানকে স্বীকৃতি দেয় এবং জিডিপিতে এর অর্থমূল্য পরিমাপ করে অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

পরিবার সমাজ ও রাষ্টীয় অর্থনীতিতে সমাজ গড়ার বিষয়ে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে সর্বত্র নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করা যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এতে করে নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমশ: কমে আসবে। নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার পেছনে এবং সর্বক্ষেত্রে তার পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে রয়েছে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে নিজকে তৈরী করে নেয়ার সুযোগের বঞ্চনা, তার ক্ষমতাহীনতা এবং অসম অবস্থান। নারীকে পরিবারে রাষ্ট্রে আপন মর্যাদায় স্থান করে নিতে হলে তার সমঅধিকার ও সমঅবস্থানের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেতেই হবে।